মুখবন্ধ

গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স নগরী থেকে। পেরিক্লিসের যুগ। এথেন্স তখন সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নাট্যকর্মের উৎকর্ষেই শুধু নয়, একটা গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র হিসেবেও তখন এথেন্সের আবির্ভাব ঘটেছে। অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে বর্জন করে পেরিক্লিস সাধারণ নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করে অ্যাসেম্বলি গঠন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রের সব প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় পদ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর জন্য তখন নির্বাচনের বিধান করা হয়েছিল। আধিকারিকদের জবাবদিহিতা ছিল অ্যাসেম্বলির কাছে।

দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাম দিয়েছিলেন 'ডেমোক্রেসি'। গ্রিক 'ডেমোস' শব্দের অর্থ ইংরেজিতে 'মব' অর্থাৎ জনতা, 'ক্রাটোস' শব্দের অর্থ শাসন। তাঁদের কাছে ডেমোক্রেসির প্রকৃত রূপ ছিল মবোক্রেসির কাছাকাছি – জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল, অপরিণত মানুষের শাসন হিসেবে। প্লেটো তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিকে' গণতন্ত্র নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন – ব্যাখ্যা করেছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কীভাবে স্বৈরশাসন বা অপশাসনে পরিণত হয়। প্লেটোর মতে, দেশ শাসনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুশাসন এবং সুশাসন তাঁর পক্ষেই নিশ্চিত করা সম্ভব, যিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নীতিবোধে সমৃদ্ধ। সাধারণ, মূর্খ মানুষদের পক্ষে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা অসম্ভব। জ্ঞানী, দার্শনিক ব্যক্তিরাই শুধু শাসক হওয়ার যোগ্য যাঁরা প্রতিভাধর ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী, যাঁদের জীবন নিজেকে নিয়ে আবর্তিত নয়, সমগ্র সমাজের সুখ ও কল্যাণের জন্য সমর্পিত। তাঁর মতে, যে রাজনৈতিক নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ নেই, জ্ঞানের দীপ্তিতে যার মন আলোকিত নয়, তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য হতে পারেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। তারপর থেকে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। পাশ্চাত্যের কিছু কিছু দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও অনেক দেশই গণতান্ত্রিক আদর্শ পুরোপুরি মেনে নেয়নি।

আজকের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। গণতন্ত্রমনা হিসেবে পরিচিত হতে পারলে এখন সবাই গৌরব বোধ করেন। বাস্তব অবস্থা এখন এমন যে গণতন্ত্রের গুণকীর্তন করা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের অনুসারী হোন বা না হোন, তিনি নিজেকে গণতন্ত্রী বলে দাবি করতে পরান্মুখ হন না। গণতন্ত্র এখন আর অপাঙ্‌ক্তেয় তো নয়ই, রীতিমতো গৌরবজনক স্থানে এর অধিষ্ঠান। বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের অর্থ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Direct Democracy) যেখানে সব নাগরিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি অংশগ্রহণ করে (যে ব্যবস্থা প্রাচীন গ্রিসে এককালে প্রচলিত ছিল), অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (Representative Democracy) যেখানে নাগরিকেরা ব্যক্তিগতভাবে নয়, প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রয়োগ করে, অথবা উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে দল-মত নির্বিশেষে সব নাগরিকের ব্যক্তিগত বা শ্রেণিগত অধিকার – বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মানুশীলনের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিশ্চিত করে।

বহুমত-বিশিষ্ট সমাজে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ভিন্নতা এবং আদর্শগত বৈচিত্র্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও চিন্তা-চেতনার বিকাশকে উৎসাহিত করে। মুক্ত বিতর্ক, সংলাপ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা গণতন্ত্রের মূল কথা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের কাছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের নিজেদের মতপ্রকাশের যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, অন্যদেরও তেমনি একই স্বাধীনতা রয়েছে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। ভলতেয়ারের মতো তাঁরা মনে করেন: I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.

আমাদের দেশসহ অনেক দেশেই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাহ্যিক রূপ নিয়েই অনেকে আচ্ছন্ন। গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত চেতনা। এই চেতনা আসে গণতন্ত্রে বিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা ও আচরণ থেকে। এসবের অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র প্রাণহীন জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো সমাজে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে না। আইন দিয়েও এদের চালু করা যায় না। নিরন্তর প্রচেষ্টা ও চর্চার মধ্য দিয়ে এদের স্ফুরণ ঘটাতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে

গড়ে ওঠে গণতন্ত্র নামে এই প্রতিষ্ঠানটি। এই উপলব্ধির মধ্যে কেন্দ্রিকতা অনুপ্রবিষ্ট হলে প্রতিষ্ঠানটির ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য সুশাসন। সুশাসন পেতে হলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার নির্বাসন দিতে হবে। ব্যক্তির ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের মোহ বিবেচনা-বোধকে আচ্ছন্ন করে, ফলে জবাবদিহিতা দুর্বল ও জনস্বার্থ বাধাগ্রস্ত হয়ে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটে।

গণতন্ত্রে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি বাছাই করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি সহজ হওয়ার কথা। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে কাজটি সত্যি সত্যি বেশ সহজ। সেসব দেশে নির্বাচন কমিশন প্রায় অদৃশ্য। আমাদের মতো দেশে, বিশেষ করে, যেসব দেশে গণতন্ত্র সবে ডানা মেলতে শুরু করেছে, নির্বাচন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নির্বাচন কর্মসূচি বা ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের মতো দেশে সেখানে নির্বাচনে জয় মূলত হয় অর্থ ও পেশিশক্তির সাহায্যে। এখন পর্যন্ত সুস্থ গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও মানসিকতা গড়ে না ওঠার ফলে নির্বাচনে এক মারাত্মক অপসংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে এবং তা নির্বাচন পরিমণ্ডলকে সামগ্রিকভাবে কলুষিত করে চলেছে। গত তিন দশকে আমাদের দেশে যে কতিপয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই জানেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে কী ব্যাপক কর্মযজ্ঞের আয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই আয়োজনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচনের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও অসদুপায় রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্বাচন বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় হয় নিরাপত্তা খাতে। একই দিনে আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রথা বিদ্যমান থাকায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি ব্যতীত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গক্রমে আমার আফ্রিকার দেশ ঘানার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। কমনওয়েলথ ইলেকশন অবজার্ভার হিসেবে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ঘানার রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার আমার সুযোগ হয়েছিল। আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছিলাম, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে একজন মাত্র ইউনিফর্ম-পরিহিত ব্যক্তি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। একজন নিরাপত্তা কর্মীর উপস্থিতিই পর্যাপ্ত বলে গণ্য হয়েছিল, যেখানে আমাদের দেশে ভোটকেন্দ্রে তখন ন্যূনতম বারো জন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের দেশে বিশ থেকে ত্রিশ জন পর্যন্ত নিরাপত্তা কর্মীর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হতো। ঘানায় একজন নিরাপত্তা কর্মীর উপস্থিতি প্রতীকী মাত্র। কারণ, সবাই যেখানে মোটামুটি আইন মেনে চলে, 'মাস্তান সংস্কৃতি', বুথ দখলের সংস্কৃতি সেখানে অনুপস্থিত। অবাক বিস্ময়ে আমি ভোট গণনা করতে দেখেছি প্রকাশ্যে – সবার সম্মুখে, মাত্র গুটি কয়েক পুলিশ কর্মচারীর উপস্থিতিতে। এশিয়া ও আফ্রিকার দুই উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই পার্থক্য আমাকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আমাদের দেশে আশির দশক পর্যন্ত নির্বাচনের ইতিহাস সুখকর নয়। সত্তর ও আশির দশকে চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮) এবং তিনটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৬) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়কালের কোনো নির্বাচনকেই বিশেষজ্ঞরা পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। ১৯৭৯ থেকে নির্বাচনে যে ভয়াবহ উপাদানগুলো দৃষ্টিগোচর হতে থাকে তা হলো সন্ত্রাস, সশস্ত্র ক্যাডারের উপস্থিতি, ভোটকেন্দ্র দখল, জালভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভীতি প্রদর্শন, নির্বাচন কর্মকর্তাদের ওপর প্রভাব খাটানো ইত্যাদি। ফলে নির্বাচন ক্রমেই অর্থহীন ও প্রহসনে পরিণত হতে থাকে। এই নির্বাচনগুলোর আয়োজন করা হয় মূলত ক্ষমতাসীন সরকার ও তাঁদের আনীত সাংবিধানিক সংশোধনীগুলোর বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে। নির্বাচনগুলোর সাধারণ প্যাটার্নই ছিল ব্যাপক কারচুপি। রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের অনুসরণযোগ্য নির্বাচনি আচরণ বিধিমালার (Code of Conduct) আইনগত ভিত্তি ছিল না। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় সরকারের মন্ত্রীদের নির্বাচনি প্রচারণাকালে নির্বাচনি এলাকায় খুশিমতো রিলিফ সামগ্রী ও অর্থ বরাদ্দ এবং উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণায় বাধা ছিল না। রাজনৈতিক দলের মাস্তানদের ভোটকেন্দ্র দখল, জালভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, নির্বাচন কর্মকর্তাদের ভীতি প্রদর্শন, ব্যালট পেপারে আগে থেকেই সিল প্রদান ইত্যাদি নির্বাচনের স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। ভোট গণনার সময় সাংবাদিক বা নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিত থাকার আইনগত কোনো বিধান ছিল না। এক কথায়, একটা সুস্থ নির্বাচনি সংস্কৃতি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গিয়েছিল আশির দশকের শেষ পর্যন্ত।

১৯৯০ সালে জোরালো দাবি উত্থাপিত হয় সব বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। এর ফলে গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে প্রথমবারের মতো এই আমলে নির্বাচনের মূল ইস্যুগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনকালে সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধ, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কতিপয় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপগুলোর একটি ছিল ১৯৯১ সালের ১৩নং আইন (Election Officials Special Provisions Act) – একটি নতুন আইন, যা ছিল বিদ্যমান নির্বাচনি সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও জরুরি। এই আইনে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপরাধী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা

গ্রহণের বিধান করা হয়েছিল। আইনটি সৌভাগ্যবশত এখনও কার্যকর রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বভার নেওয়ার মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনটি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে পুনরায় প্রবল দাবি ওঠে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সাধারণ নির্বাচনের জন্য। দাবির সমর্থনে দেশব্যাপী হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। সংকট নিরসনে মধ্যস্থতাকারী কমনওয়েলথ মহাসচিব চিফ এমেকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ তারিখে একতরফা বিরোধীদলহীন ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্মাত্মক লাগাতার অসহযোগের মুখে মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ সাংবিধানিক সংশোধনী পাস ও সরকার-প্রধানের পদত্যাগের পর বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ৩০ মার্চ। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুপারিশক্রমে আমাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত এটিই অদ্যাবধি একমাত্র নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্টকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মতো মাত্র দুমাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের এক সংকটময় মুহূর্তে। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে দুরুহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল ওই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে। সংশ্লিষ্ট সবার আস্থা অর্জন ও অনুকূল নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির দিকে কমিশনকে সর্বোচ্চ মনোযোগ ও অগ্রাধিকার দিতে হয়েছিল। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চিহ্নিত মাস্তান ও দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার, সতর্কতার সাথে নির্বাচন কর্মকর্তা বাছাই ও প্রশিক্ষণ, প্রচারাভিযানে সব দলের সমান সুযোগ, ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি, নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সব স্তরে স্বচ্ছতা ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়াও সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে কমিশন একটা সর্বসম্মত নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা আইনের (RPO 1972) আওতায় জারি করে। প্রথমবারের মতো এই বিধিমালা সমঝোতা (Understanding বা agreement) হিসেবে নয়, আইন হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বিচার ও রায়ের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষকদের মতে আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এই আচরণ বিধিমালা 'Proved to be highly effective in regulating the conduct of political parties and candidates.'

নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় এই সুবাতাস বইতে থাকে পরবর্তী অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০১ ও ২০০৮) পর্যন্ত। এই দুটি নির্বাচনেও জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা বেড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই এই দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তম (জুন ১৯৯৬) জাতীয় সংসদ নির্বাচন রেকর্ড-সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি আইন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে এবং রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় নির্বাচনি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সবার কাছে একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা পাঠায়। ফেমা (Fema) নামে একটি বেসরকারি সংগঠন এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এবং বেশ কয়েকটি ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করে। আজকের সুপরিচিত 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর আবির্ভাব তখনও ঘটেনি। পরবর্তীকালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নাগরিক সমাজের সংস্কার দাবির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে' (RPO 1972) কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। আইনের যুক্তিসংগত সংশোধনের ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আসে। এই সংশোধনগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা, ভোটার পরিচয়পত্র, প্রার্থীদের তথ্যসংবলিত হলফনামা ও নির্বাচনি আচরণবিধি ইত্যাদি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এখতিয়ার থেকে মুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে জোরদার করা হয়। এই সব সংস্কার ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের পথ সুগম করে তুলেছিল।

গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের পরবর্তী অভিজ্ঞতা প্রীতিকর নয়। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (জানুয়ারি ৫, ২০১৪) অনুষ্ঠিত হয়েছিল মূলত সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার জন্য। নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ছিল না। একটি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করে। অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক না হলে নির্বাচন আদৌ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। নির্বাচনের এই অপরিহার্য চরিত্র আমরা ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখতে পাইনি। এই নির্বাচনে ১৫৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হন। মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ভোটার তাদের প্রতিনিধি বাছাই করার সুযোগ পাননি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার ছিল ৪০% এর মতো, যেখানে আগের নির্বাচনগুলোয় (সপ্তম থেকে নবম) এই হার ছিল ৭০ শতাংশেরও অধিক। বহু নির্বাচনি এলাকা থেকে বেপরোয়া নিয়ম-বিধি লঙ্ঘন, ব্যাপক কারচুপি ও সহিংসতার ভয়াবহ রিপোর্ট পাওয়া যায়।

সম্প্রতি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ডিসেম্বর, ২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হলেও নির্বাচনটি নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। নির্বাচনে নির্বাচনি আইন ও বিধি-বিধান পালনে শৈথিল্য লক্ষ করা গেছে। ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যম অনুযায়ী ভোটার উপস্থিতির হার পঞ্চাশ শতাংশেরও নিচে। অনেকের মতে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হলেও নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধির কার্যকর প্রয়োগের অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও নির্বাচনের আগের রাতে ব্যাপকভাবে ব্যালট বাক্স ভর্তি করার গুরুতর অভিযোগ এ নির্বাচনে উঠেছে। এছাড়াও নির্বাচনের আগের রাতে ব্যাপকভাবে ব্যালট বাক্স ভর্তিসহ আরও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ এ নির্বাচনে উঠেছে।

দেশের নাগরিক সমাজের এক স্বনামধন্য সংগঠনের নাম 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে সুজন পথ চলতে শুরু করেছে কার্যত ২০০২ সাল থেকে। রাজনৈতিক ও নির্বাচনি সংস্কারের কাজ সুজন হাতে নেয় প্রথমেই। অতি সংগত কারণেই সুজন মনে করে, নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন, তবেই শুধু দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুজন অসংখ্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও নির্বাচনি অলিম্পিয়াডের মতো অভিনব কর্মকাণ্ড, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, রাজনীতিবিদ-সহ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করে। জাতীয় পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা, পরবর্তী সময়ে জাতীয় কনভেনশনে কতিপয় সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। সুজন-এর জন্য এটা একটা মস্তবড় কৃতিত্ব যে, এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো সারা দেশে জোরালো আন্দোলনের রূপ নেয় এবং উপযুক্ত সময়ে সরকারের নীতিনির্ধারক ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো ছিল – নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে শক্তিশালীকরণ, রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন, রাজনৈতিক দলসমূহের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্য যাচাই, আচরণবিধি লঙ্ঘনকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও 'না' ভোটের বিধান প্রবর্তন।

আনন্দের বিষয়, সুজনের পেশকৃত অধিকাংশ প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করে এবং পরে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে এই বিধানগুলো সন্নিবেশিত হয়। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে অধ্যাদেশটি অনুমোদনের সময় 'না' ভোটের বিধানটি বাদ দেওয়া হয়, যদিও অনেক দেশেই এই বিধানটি আছে এবং আমাদের দেশে বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিসংগত কারণেই 'না' ভোটের বিধান থাকা প্রয়োজন। আমি মনে করি, প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও আয়-ব্যয়ের অডিট করা হিসাব (যা সংশোধিত আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হয়) নাগরিকদের জানার অধিকার নিশ্চিতকরণ – সুজন-এর তিনটি বড় রকমের অর্জন। প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তি ও নাগরিকদের রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রাপ্তি উচ্চ আদালতে আইনি লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে সুজনকে নিশ্চিত করতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই সংস্কারগুলো দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণে এবং নির্বাচনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধানে বলিষ্ঠ ও অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ।

বর্তমান গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে আটটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই তথ্যাবলি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, রুজুকৃত ফৌজদারি মামলা (যদি থাকে), মামলার ফলাফল, পেশা, আয়ের উৎস, নির্ভরশীলদের সম্পদ, দায়-দেনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। ভোটারদের জন্য প্রার্থী সম্পর্কে এই মৌলিক তথ্যাবলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তারা তথ্যাদি বিবেচনায় এনে সচেতনভাবে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ভোটারদের এই ক্ষমতায়ন সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির এই অধিকার সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুজনকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আইনি লড়াই করতে হয়েছে। তাদের দৃঢ় প্রত্যয়, সাহস ও অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য আমি সুজনকে সাধুবাদ জানাই।

নির্বাচন কমিশন দেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সব নির্বাচনের দায়ভার কমিশনের ওপর ন্যস্ত। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের পূর্ণ দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের সব সদস্যকে – প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার – শপথ গ্রহণ করতে হয় যে তাঁরা সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করবেন। সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন স্বীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন – প্রতিষ্ঠানটি শুধু সংবিধান ও আইনের অধীন। অর্থাৎ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি সেরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। স্বাধীনভাবে অবাধ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংবিধানে এই সব বিধান করা হয়েছে ও নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তাই নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। বাস্তবতার নিরিখে ইতোমধ্যে নির্বাচনি আইনের নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে নির্বাচন কমিশনকে আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী এবং তাঁদের দায়িত্ব পালন সুগম করে তোলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনবল ছাড়াও নির্বাহী বিভাগের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত হয়ে থাকেন। তাঁদের ওপর নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য, অবহেলা, ঔদাসীন্য বা পক্ষপাতিত্বের কারণে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কঠিন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইনের কার্যকর প্রয়োগের ব্যাপারেও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া আইন অর্থহীন।

নির্বাচন কমিশন ভয়, ভীতি, অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীনভাবে সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ দৃঢ়তার সাথে পালন করবে এটাই সবার প্রত্যাশা। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক, কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত ও ফলপ্রসূ হোক– এই কামনা করি।

মোহাম্মদ আবু হেনা
সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার